পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহ্য

পালামৌ

প্রথম প্রবন্ধ

বহুকাল হইল আমি একবার পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলাম, প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই-একজন বন্ধুবান্ধব আমাকে পুনঃপুন অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তাৎপর্য বয়স। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না-শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেকদিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি এমত নহে। পূর্বে সেই সকল নির্জন পর্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা সৌন্দর্য প্রভৃতি ভালোবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোনও প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে সে স্থান কোনদিকে, কতদূরে। অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে এই বিবেচনায় ইন্‌ল্যান্ড ট্রাঞ্জিট কোম্পানির (Inland Transit Company) ডাকগাড়ি **ম**ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রানিগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্বপারে গাড়ি থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, গাড়ি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

পূর্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গালায় বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, সম্মুখে একজন চাপরাশি একরূপ গৈরিক মৃত্তিকা হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে

আসিতেছে, চাপরাশি তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকাদ্বারা কী অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য-লোকই অধিক, তাহাদের যুবতীরা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে, আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কীরূপ দেখাইতেছে, তাহাও এক-একবার দেখিতেছে। শেষে যুবতীরা হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া, কূলের উপর উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি এমত সময়ে কুলিদের কতকগুলি বালক-বালিকা আসিয়া আমার গাড়ি ঘেরিল। "সাহেব একটি পয়সা" "সাহেব একটি পয়সা" এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। ধুতি চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙালি বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি।" একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরিবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কী?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙালি।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না, তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ি চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

এই সময় একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সে-ও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সাথে তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময় আমার গাড়ি অপর পাড়ে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই-একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়। অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে ইহা আর আশ্চর্য কী? বাল্যকালে পাহাড়-পর্বতের পরিচয় অনেক শুনা ছিল, বিশেষত একবার এক বৈরাগী আখড়ায় চুনকাম-করা এক গিরিগোবর্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। কৃষক-কন্যারা শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিয়া যে স্তূপ করে, বৈরাগীর গোবর্ধন তাহা অপেক্ষা কিছু বড়। তাহার স্থানে স্থানে চারি-

পাঁচখানি ইষ্টক গাঁথিয়া এক-একটি চূড়া করা হইয়াছে। আবার সর্বোচ্চ চূড়ার পার্শ্বে এক সর্পফণা নির্মাণ করিয়া তাহা হরিত, পীত, নানা বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে, পাছে সর্পের প্রতি লোকের দৃষ্টি না পড়ে এইজন্য ফণাটি কিছু বড় করিতে হইয়াছে। কাজেই পর্বতের চূড়া অপেক্ষা ফণাটি বড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মিস্ত্রির গুণ নহে, বৈরাগীরও দোষ নহে। সর্পটি কালীয়দমনের কালীয়, কাজেই যে পর্বতের উপর কালীয় উঠিয়াছে, সে পর্বতের চূড়া অপেক্ষা তাহার ফণা যে কিছু বৃহৎ হইবে ইহার আর আশ্চর্য কী? বৈরাগীর এই গিরিগোবর্ধন দেখিয়া বাল্যকালেই পর্বতের অনুভব হইয়াছিল। বরাকরের নিকট পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সেই বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্নে দেখিলাম একটি সুন্দর পর্বতের নিকট দিয়া গাড়ি যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, “কোথা যাইবেন?” আমি বলিলাম, “একবার এই পর্বতে যাইব।” সে হাসিয়া বলিল, “পাহাড় এখান হইতে অধিক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।” আমি এ কথা কোনওরূপে বিশ্বাস করিলাম না। আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথা যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়ওয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে ১৫ মিনিট কাল দ্রুতপদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্বত পূর্বমতো সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্বতসম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙালির পক্ষে বড় কঠিন, ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃপুন পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্তা কীরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর সাবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ি লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত

আমার কখনও চাক্ষুষ হয় নাই। তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যাতিও যথেষ্ট শুনিয়াছি; সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন না বঙ্গবাসীমাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভালো কাপড়, ভালো জুতা পড়ায়; কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনার পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখ ভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ, প্রতিবাসীরা! যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসী-পরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রম-পার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষি-পত্নীকে অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতির পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটি মেজিস্ট্রেটির দরখাস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে সে সকল কথা যাক। যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ি প্রবেশ করিলে তাহা কোনও ধনবান ইংরেজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারান্দায় গুটিকত বাঙালি বসিয়া আমার গাড়ি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ি থামিলে আমি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন সর্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্তা। তিনি শত লোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধহয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধহয় সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না,

এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি। প্রথম সম্ভাষণ সমাপন হইলে পর স্নানাদি করিতে যাওয়া গেল। স্নান গোছলখানায় ইংরেজি মতেই হইল, কিন্তু আহার ঠিক হিন্দুমতে হয় নাই, কেন না, তাহাতে পলাণ্ডুর আধিক্য ছিল। পলাণ্ডু হিন্দুধর্মের বড় বিরোধী। তদ্ভিন্ন আহারের আর কোনও দোষ ছিল না, সঘৃত আতপান্ন, আর দেবীদুর্লভ ছাগমাংস, এই দুই-ই নির্দোষী।

পাকসম্বন্ধে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু পিঁয়াজ উল্লেখ করাই আমার ইচ্ছা ছিল। পিঁয়াজ যাবনিক শব্দ, এই ভয়ে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়া সাধুগণের মুখ পবিত্র রাখিয়াছি, কিন্তু পিঁয়াজ পলাণ্ডু এক দ্রব্য কি না, এ বিষয়ে আমার বহুকালাবধি সংশয় আছে। একবার পাঞ্জাব অঞ্চলের একজন বৃদ্ধ রাজা জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইবার সময় মেদিনীপুরে দুই-এক দিন অবস্থিতি করেন। নগরের ভদ্রলোকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে, তিনি কি প্রধান, কি সামান্য, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতেছিলেন, এমত সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন জোড়হস্তে বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছিলাম যে, মহারাজ হিন্দুচূড়ামণি, কিন্তু আসিবার সময় আপনার পাকশালার সম্মুখে পলাণ্ডু দেখিয়া আসিয়াছি।" বিস্ময়াপন্ন রাজা "পলাণ্ডু"! এই শব্দ বার বার উচ্চারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদারকের নিমিত্ত স্বয়ং উঠিলেন, নগরস্থ ভদ্রলোকেরাও তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন। রাজা পাকশালার সম্মুখে দাঁড়াইলে, একজন বাঙালি পিঁয়াজের স্তূপ দেখাইয়া দিল। রাজা তখন হাসিয়া বলিলেন, "ইহা পলাণ্ডু নহে; ইহাকে পিঁয়াজ বলে। পলাণ্ডু অতি বিষাক্ত সামগ্রী, তাহা কেবল ঔষধে ব্যবহার হয়। সকল দেশে তাহা জন্মে না; যে মাঠে জন্মে, মাঠের বায়ু দূষিত হইয়া যায়, এই ভয়ে সে মাঠ দিয়া কেহ যাতায়াত করে না। সে মাঠে আর কোনও ফসল হয় না।"

রাজার এই কথা যদি সত্যি হয়, তাহা হইলে অনেকে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। পলাণ্ডু আর পিঁয়াজ এক সামগ্রী কি না, তাহা পশ্চিম প্রদেশে অনুসন্ধান হইতে পারে, বিশেষত যে সকল বঙ্গবাসীরা সিন্ধুদেশ অঞ্চলে আছেন, বোধহয় তাঁহারা অনায়াসেই এই কথার মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন।

আহারান্তে বিশ্রামগৃহে বসিয়া বালকদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে বালকদের শয়নঘর দেখিতে উঠিয়া গেলাম। ঘরটি বিলক্ষণ পরিসর, তাহার চারি কোণে চারিখানি খাট পাতা, মধ্যস্থলে আর একখানি খাট

রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বালকেরা বলিল, “চারি কোণে আমরা চারিজন শয়ন করি, আর মধ্যস্থলে মাস্টার মহাশয় থাকেন।” এই বন্দোবস্ত দেখিয়া বড় পরিতৃপ্ত হইলাম। দিবারাত্র বালকদের কাছে শিক্ষক থাকার আবশ্যকতা অনেকে বুঝেন না।

বালকদের শয়নঘর হইতে বহির্গত হইয়া আর এক ঘরে দেখি, এক কাঁদি সুপক্ক মর্তমান রম্ভা দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহাতে একখানি কাগজ ঝুলিতেছে, পড়িয়া দেখিলাম, নিত্য যত কদলী কাঁদি হইতে ব্যয় হয়, তাহাই তাহাতে লিখিত হইয়া থাকে। লোকে সচরাচর ইহাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ছোট নজর ইত্যাদি বলে; কিন্তু আমি তাহা কোনওরূপে ভাবিতে পারিলাম না। যেরূপ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত দেখিলাম, তাহাতে ‘কলাকাঁদির হিসাব’ দেখিয়া বরং আরও চমৎকৃত হইলাম। যাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অন্য বিষয় দেখিতে পায় না। তাহারা যথার্থই নীচ। কিন্তু আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, দেখিলাম তাঁহার নিকট বৃহৎ- সূক্ষ্ম সকলই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে আছেন, বড় বড় বিষয় মোটামুটি দেখিতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি একেবারে পড়ে না। তাঁহাদের প্রশংসা করি না। যাঁহারা বৃহৎ-সূক্ষ্ম একত্র দেখিয়া কার্য করেন, তাঁহাদেরই প্রশংসা করি। কিন্তু এরূপ লোক অতি অল্প। ‘কলাকাঁদির ফর্দ’ সম্বন্ধে বালকদিগের সহিত কথা কহিতে কহিতে জানিলাম যে, একদিন এক চাকর লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া দুইটি সুপক্ক রম্ভা উদরস্থ করিয়াছিল, গৃহস্থের সকল বিষয়েই দৃষ্টি আছে, সকল বিষয়েরই হিসাব থাকে, কাজেই চুরি ধরা পড়িল। তখন তিনি চাকরকে ডাকিয়া চুরির জন্য জরিমানা করিলেন। পরে তাহার লোভ পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত যত ইচ্ছা কাঁদি হইতে রম্ভা খাইতে অনুমতি করিলেন। চাকর উদর ভরিয়া রম্ভা খাইল।

অপরাহ্নে আমি উদ্যানে পদচারণ করিতেছি, এমত সময় গৃহস্থ ‘কাছারি’ হইতে প্রত্যাগত হইলেন। পরে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাগান, পুষ্করিণী, সমুদয় দেখাইতে লাগিলেন। যে স্থান হইতে যে বৃক্ষটি আনাইয়াছেন, তাহারও পরিচয় দিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নকালে ‘কলাকাঁদি’ সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহা তখনও আমার মনে পুনঃপুন আলোচিত হইতেছিল; কাজেই আমি কদলীবৃক্ষের প্রসঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, “আমার ধারণা ছিল এ অঞ্চলে রম্ভা জন্মে

না; কিন্তু আপনার বাগানে যথেষ্ট দেখিতেছি।” তিনি উত্তর করিলেন, “এখানে বাজারে কলা পাওয়া যায় না। পূর্বে কাহারও বাটীতেও পাওয়া যাইত না। লোকের সংস্কার ছিল যে, এই প্রস্তরময় মৃত্তিকায় কলার গাছ রস পায় না, শুকাইয়া যায়। আমি তাহা বিশ্বাস না করিয়া, দেশ হইতে ‘তেড়’ আনিয়া পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে আমার নিকট হইতে ‘তেড়’ লইয়া সকল সাহেবই বাগানে লাগাইয়াছেন। এখন আর এখানে কদলীর অভাব নাই।” এইরূপ কথাবার্তা কহিতে কহিতে আমরা উদ্যানের এক প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় দুইটি স্বতন্ত্র ঘর দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করায় গৃহস্থ বলিলেন, “উহার একটিতে আমার নাপিত থাকে, অপরটিতে আমার ধোপা থাকে। উহারা সম্পূর্ণ আমার বেতনভোগী চাকর নহে, তবে উভয়কে আমার বাটীতে স্থান দিয়া এক প্রকারে আবদ্ধ করিয়াছি। এখন যখনই আবশ্যক হয়, তখনই তাহাদের পাই। ধোপা, নাপিতের কষ্ট পূর্বে আর কোনও উপায়ে নিবারণ করিতে পারি নাই।”

সন্ধ্যার পর দেখিলাম, শিক্ষক-সম্মুখে বালকেরা যে টেবিলে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, তথায় একত্র একস্থানে তিনটি সেজ জ্বলিতেছে। অন্য লোক যাঁহারা কদলীর হিসাব রাখেন না, তাঁহারা বালকদের নিমিত্ত একটি সেজ দিয়া নিশ্চিন্ত হন, আর যিনি কদলীর হিসাব রাখেন, তিনি এই অতিরিক্ত ব্যয় কেন স্বীকার করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল জন্মিল। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “ইহা অপব্যয় নহে, অল্প আলোকে অধ্যয়ন করিলে বালকের চক্ষু দুর্বল হইবার সম্ভাবনা; যথেষ্ট আলোকে অধ্যয়ন করিলে চল্লিশের বহু পরে ‘চালশা’ ধরে।”

উচ্চপদস্থ সাহেবরা সর্বদাই তাঁহার বাটীতে আসিতেন, এবং তাঁহার সহিত কথাবার্তায় পরমাপ্যায়িত হইতেন। বাঙালিরা ছোট-বড় সকলেই তাঁহার সৌজন্যে বাধ্য ছিলেন, যে কুঠীতে তিনি বাস করিতেন, সেরূপ কুঠী সাহেবদেরও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; কুঠীটি যেরূপ পরিষ্কৃত ও সুসজ্জীভূত ছিল, তাহা দেখিলে যথার্থই সুখ হয়, মনও পবিত্র হয়। মনের উপর বাসস্থানের আধিপত্য বিলক্ষণ আছে। যাহারা অপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ঘরে বাস করে, প্রায় দেখা যায়, তাহাদের মন সেইরূপ অপরিষ্কৃত ও ক্ষুদ্র। যিনি বিশ্বাস না করেন, তিনি বলিতে পারেন যে, যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ বাঙালির মন ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কৃত হইত। আমরা এ কথা লইয়া কোনও তর্ক করিব না, আমরা যেমন দেখিতে পাই, সেইমত

শিখিয়াছি। যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছি, তাঁহার মন, 'কুঠী'র উপযোগী ছিল। সেরূপ কুঠীর ভাড়ায় যে ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয় করে, সে ব্যক্তি যদি কদলীর হিসাব রাখে, তাহা হইলে কী বুঝা কর্তব্য?

রাত্রি দেড়প্রহরের সময় বাহকস্কন্ধে আমি ছোটনাগপুর যাত্রা করিলাম। তথা হইতে পালামৌ দুই-চারিদিনের মধ্যে পৌঁছিলাম। পথের পরিচয় আর দিব না, এই কয়েক ছত্র লিখিয়া অনেককে জ্বালাতন করিয়াছি, আর বিরক্ত করিব না, এবার ইচ্ছা রহিল, মূল বিবরণ ভিন্ন অন্য কথা বলিব না, তবে যদি দুই-একটি অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে বয়সের দোষ বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

সেকালের হরকরা নামক ইংরেজি পত্রিকায় দেখিতাম, কোন একজন মিলিটারি সাহেব ‘পেরেড’ বৃত্তান্ত, ‘ব্যান্ডের’ বাদ্যচর্চা প্রভৃতি নানা কথা পালামৌ হইতে লিখিতেন । আমি তখন ভাবিতাম, পালামৌ প্রবল শহর, সাহেবসমাকীর্ণ সুখের স্থান । তখন জানিতাম না যে, পালামৌ শহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগণামাত্র । শহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ।

পাহাড় আর জঙ্গল বলিলে কে কী অনুভব করেন বলিতে পারি না । যাঁহারা “কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার কৃত” পাহাড় দেখিয়াছেন, আর যাঁহাদের গৃহপার্শ্বে শৃগালশান্তি সংবাহক ভাটভেরাণ্ডার জঙ্গল আছে, তাঁহারা যে এ কথা সমগ্র অনুভব করিয়া লইবেন, ইহার আর সন্দেহ নাই । কিন্তু অন্য পাঠকের জন্য সেই পাহাড়-জঙ্গলের কথা কিঞ্চিৎ উত্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে । সকলের অনুভবশক্তি তো সমান নহে ।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দেশমতো দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্তে মেঘ করিয়াছে । আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম । ওই অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল । কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম ।

পরে চারি-পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পালকি হইতে অবতরণ করিলাম । তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভালো চেনা গেল না । তাহার পরে আরও দুই-এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে, তাম্রাভ অরণ্য

চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান সমুদয় যেন মেঘদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজিদ্বারা সর্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষ আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে সর্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন– ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম, সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধহয় যেন অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম, সকল তরঙ্গগুলি পূর্ব দিক হইতে উঠিয়াছিল, কোনও কোনওটি পূর্ব দিক্ হইতে উঠিয়া পশ্চিম দিকে নামে নাই। এইরূপ অর্ধপাহাড় লাতেহার গ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই, সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়; এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কালো পাথর, ইত্যাদি। কিন্তু কোনও স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্বে লক্ষ করি নাই, লক্ষ করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। এক দিন অপরাহ্ণে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমত সময় আমার একটা নেমকহারাম ফরাসিস কুক্কুর (poodle) আপন ইচ্ছামতো তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি রাগত হইয়া চিৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চিৎকার অত্যাশ্চর্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চিৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্বমতো হ্রস্ব-দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চিৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ-নিচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোনও একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে, শব্দও সেইখানে উঠিতে-নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যত দূর পর্যন্ত সেই স্তরটি আছে, ততদূর পর্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ কন্‌ডক্টার (Conductor); যে পর্যন্ত ননকন্‌ডাকটরের সঙ্গে সংস্পর্শ না হয়, সে পর্যন্ত শব্দ ছুটিতে থাকে।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝরঝর করিতেছে। তাহার এক স্থান অনেক দূর পর্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থ বৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থ গাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই। এখন বোধহয় অশ্বত্থ গাছটি আপন অবস্থানুরূপ কার্য করিতেছে; সকল বৃক্ষই যে বাঙ্গালার রসপূর্ণ কোমল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনা কষ্টে কাল যাপন করিবে, এমত সম্ভব নহে। যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন। এখন আমি অশ্বত্থটির প্রশংসা করি। এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই-একটি বলি। অপরাহ্ণে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্বতশ্রেণি দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সংকীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পালকি চলিতে লাগিল, অনেক স্থলে উভয়পার্শ্বস্থ লতাপল্লব পালকি স্পর্শ করিতে লাগিল। বনবর্ণনায় যেরূপ "শাল তাল তমাল, হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল, হিন্তাল একেবারেই নাই; কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশীয় কদম্ববৃক্ষের মতো, না হয় কিছু বড়; কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথাও তাহার ছেদ নাই, এই জন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে এক স্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিষণ্নকর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়; এইজন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরও যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না তাহা বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটি মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পালকির প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর দূরে নহে। অল্প

বিলম্বেই অর্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে-সেখানে দুই-একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্বতছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখন দেখি নাই; সকলের গলায় পুতির সাতনরী, ধুক্‌ধুকির পরিবর্তে এক একখানি গোল আরসি; পরিধানে ধড়া, কর্ণে বনফুল; কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে, কেহ-বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে, কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান, তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল; চারিদিকে কালো পাথর, পশুও পাথুরে; তাহাদের রাখালও সেইরূপ। এই স্থলে বলা আবশ্যক এ অঞ্চলে মহিষ ভিন্ন গরু নাই। আর বালকগুলি কোলের সন্তান।

এই অঞ্চলে প্রধানত কোলের বাস। কোলেরা বন্য জাতি, খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান, তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না! যে সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায়, তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান দেখি নাই; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোল মাত্রেই রূপবান, অন্তত আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ-বত্রিশটি গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটির। আমার পালকি দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মতো কালো, সকলেই যুবতী, সকলেরই কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ান; সকলেরই কক্ষ, বক্ষ আবরণশূন্য। সেই নিরাবৃত বক্ষে পুতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরসি ঝুলিতেছে, কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু দেখিল কেবল পালকি আর বেহারা। পালকির ভিতরে কে বা কী, তাহা কেহই দেখিল না। আমাদের বাঙ্গালায়ও দেখিয়াছি, পল্লিগ্রামে বালক-বালিকারা প্রায় পালকি আর বেহারা দেখিয়া ক্ষান্ত হয়। তবে যদি সঙ্গে বাদ্য থাকে, তাহা হইলে 'বর-কনে' দেখিবার নিমিত্ত পালকির ভিতর দৃষ্টিপাত করে। যিনি পালকি চড়েন, সুতরাং তিনি দুর্ভাগ্য, কিন্তু গ্রাম্য বালক-বালিকারাও অতি নিষ্ঠুর, অতি নির্দয়।

তাহার পর আবার কতকদূর গিয়া দেখিলাম, পথশ্রান্তা যুবতীরা মদের ভাঁটিতে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। গ্রামমধ্যে যে যুবতীদের দেখিয়া আসিয়াছি, ইহারাও আকারে অলঙ্কারে অবিকল সেইরূপ, যেন তাহারাই আসিয়া বসিয়াছে। যুবতীরা উভয় জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া দুই হস্তে শালপত্রের পাত্র ধরিয়া মদ্যপান করিতেছে, আর ঈষৎ হাস্যবদনে সঙ্গীদের দেখিতেছে। জানু স্পর্শ করিয়া উপবেশন করা কোলজাতির স্ত্রীলোকদিগের রীতি; বোধহয় যেন সাঁওতালদিগেরও এই রীতি দেখিয়াছি। বনের মধ্যে যেখানে-সেখানে মদের ভাঁটি দেখিলাম, কিন্তু বাঙ্গালায় ভাঁটিখানায় যেরূপ মাতাল দেখা যায়, পালামৌ পরগণায় কোনও ভাঁটিখানায় তাহা দেখিলাম না। আমি পরে তাহাদের আহার-ব্যবহার সকলই দেখিতাম, কিছুই তাহারা আমার নিকট গোপন করিত না, কিন্তু কখনও স্ত্রীলোকদের মাতাল হইতে দেখি নাই, অথচ তাহারা পানকুণ্ঠ নহে। তাহাদের মদের মাদকতা নাই, এ কথাও বলিতে পারি না। সেই মদ পুরুষেরা খাইয়া সর্বদা মাতাল হইয়া থাকে।

পূর্বে কয়েকবার কেবল যুবতীর কথাই বলিয়াছি, ইচ্ছাপূর্বক বলিয়াছি এমন নহে। বাঙ্গালার পথে, ঘাটে, বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়, কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে যুবতীই অধিক দেখা যায়। কোলের মধ্যে বৃদ্ধা অতি অল্প, তাহারা অধিকবয়সী হইলেও যুবতীই থাকে, অশীতিপরায়ণা না হইলে তাহারা লোলচর্মা হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহকার্য কৃষিকার্য সকল কার্যই তাহারা করে, পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তান রক্ষা করে, কখনও কখনও চাটাই বুনে। আলস্য জন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়; স্ত্রীলোকেরা শ্রমহেতু চিরযৌবনা থাকে। লোকে বলে পশুপক্ষীর মধ্যে পুরুষজাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর; মনুষ্যমধ্যেও সে-ই নিয়ম। কিন্তু কোলদের দেখিলে তাহা বোধ হয় না, তাহাদের স্ত্রীজাতিরাই বলিষ্ঠা ও আশ্চর্য কান্তিবিশিষ্টা। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খড়ি উঠিতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই, যেন সকলেরই জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে। আমার বোধহয় কোলজাতির ক্ষয় ধরিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবনীশক্তি যেরূপ কমিয়া যায়, জাতিবিশেষেরও জীবনীশক্তি সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। মনুষ্যের মৃত্যু আছে, জাতিরও লোপ আছে।

এই পরগণায় পর্বতে স্থানে স্থানে অসুরেরা বাস করে, আমি তাহাদের দেখি নাই, তাহারা কোলদের সহিত বা অন্য কোনও বন্য জাতির সহিত